সামাজিক সমস্যা
Social problem

ইউনিট ১৩

'সামাজিক সমস্যা' একটি চিরন্তন এবং আপেক্ষিক বিষয়। প্রতিটি সমাজেই কিছু না কিছু সমস্যা থাকে। মধ্যযুগের সমাজে এক ধরনের সমস্যা আবার উত্তর-আধুনিক সমাজে ভিন্নতর কোনো সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। একইভাবে দরিদ্র, অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক সমস্যা থেকে উন্নত দেশের সামাজিক সমস্যা আলাদা। কিন্তু 'সমস্যামুক্ত সমাজ' নেই বললেই চলে। বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান একটি দেশ। এখানে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এর প্রভাব পড়ছে সমাজে। দেখা যাচ্ছে নানাবিধ নতুন নতুন সমস্যা। তবে চিরায়ত বাংলাদেশে দীর্ঘকালের কিছু সামাজিক সমস্যা রয়েছে যা থেকে আমরা এখনো পরিত্রাণ পায়নি। যেমন: দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগ নেওয়া হলেও দারিদ্র্যকে পুরোপুরি দূর করা যায়নি। দারিদ্র্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। সীমিত ভূখণ্ডে অধিক জনসংখ্যা, নিরক্ষরতা এবং কর্মমুখী শিক্ষার অভাব বেকারত্ব হ্রাসের অন্তরায়। অধিক জনসংখ্যাও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। মাদকাসক্তি, দুর্নীতি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা পরিবর্তিত সমাজের অনস্বীকার্য বাস্তবতা। এসব সমস্যার নানা কারণ যেমন আছে, তেমনি আছে প্রতিকার। এই ইউনিটে নির্বাচিত কিছু সামাজিক সমস্যা, এর কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৮ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৩.১: সামাজিক সমস্যা
পাঠ ১৩.২: দারিদ্র্য
পাঠ ১৩.৩: দারিদ্রের কারণ ও দারিদ্র্য নিরসনের উপায়
পাঠ ১৩.৪: বেকার সমস্যা
পাঠ ১৩.৫: জনসংখ্যা সমস্যা
পাঠ ১৩.৬: অধিক জনসংখ্যার প্রভাব
পাঠ ১৩.৭: মাদকাসক্তি
পাঠ ১৩.৮: দুর্নীতি

পাঠ-১৩.১ সামাজিক সমস্যা
Social problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন;
- সামাজিক সমস্যার কারণ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সামাজিক সমস্যা।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সমাজে মানুষ কতগুলো স্থায়ী ব্যবস্থা তথা সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি সব সময় সাবলিল থাকে না। সেখানে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যাতে সমাজের একটি বড় অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ বিপন্ন বোধ করে। সমাজে কোনো বিষয়ে এরূপ পরিস্থিতি তৈরি হলে তাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা হচ্ছে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের জন্য ক্ষতিকর, অস্বস্তিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ বিশেষ পরিস্থিতি।

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা (Definition of social problem)

সমাজবিজ্ঞানী হর্টনের (P. B. Horton) মতে, "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন অবস্থা বোঝায় যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যা সমষ্টিগতভাবে মোকাবেলা করার প্রয়োজন হয়।" কোয়েনিগ (Samuel Koenig) বলেন, "সামাজিক সমস্যা হলো এমন ধরনের পরিস্থিতি বা অবস্থা যা সমাজ তার প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা কল্যাণের প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করে এবং সে কারণে এগুলোর লাঘব বা উচ্ছেদের প্রয়োজন অনুভব করে।" ডেভিড ড্রেসলার বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা হল মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে মনে করে এবং প্রতিকার বা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তা দূরীকরণে তারা বিশ্বাসী।"

সুতরাং সামাজিক সমস্যা হচ্ছে এমন একটি বিশেষ অবস্থা যা মানুষের স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত জীবন যাপন এবং সমাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সামাজিক সমস্যা খুব সাময়িক ঘটনা নয়; তবে এটি সমাধানযোগ্য। একটি সমস্যার সমাধান হলে সমাজে আবার নতুন কোনো সমস্যার আর্বিভাব হতে পারে।

সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of social problem)

সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য কতগুলো বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে থাকেন। এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে কোনো সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন:

১। অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর: সামাজিক সমস্যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এটি এমন একটি অবস্থা যা মানুষের বাঞ্ছিত ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে এবং সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

২। সমাজের অধিকাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে: কোনো সামাজিক অবস্থা যখন সমাজের অনেক মানুষকে প্রভাবিত এবং ক্ষতিগ্রস্থ করে কেবল তখনই তাকে সামাজিক সমস্যারূপে গণ্য করা হয়।

৩। জনগণের সচেতনতা: যে সমস্যা সম্পর্কে সবাই জানে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের চেষ্টা করে তাকে সামাজিক সমস্যা বলে। তবে সমাজের অধিকাংশ মানুষ কোনো সমস্যা সম্পর্কে সচেতন না হলেও তা সামাজিক সমস্যা হতে পারে। যেমন: মধ্যযুগে বাল্যবিবাহ কিংবা নিরক্ষরতা সম্পর্কে মানুষ তেমন সচেতন ছিল না। কিন্তু বাল্যবিবাহ ও নিরক্ষরতার ক্ষতিকর প্রভাব ছিল এবং এগুলো তখনো সামাজিক সমস্যাই ছিল।

৪। সমাধান যোগ্যতা: কারণ নির্ণয় করে সামাজিক সমস্যার সমাধান দেয়া সম্ভব। সমাধান সম্ভব নয়– এমন কোনো

বিষয়কে সামাজিক সমস্যা বলে বিবেচনা করা যায় না। যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাক সামাজিক সমস্যা নয়।

৫। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা: সামাজিক সমস্যাগুলো একটি অপরটি দ্বারা প্রভাবিত। যেমন দরিদ্রতার ফলে স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। আবার স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারিয়ে দরিদ্র হয়ে পড়ে।

৬। সমাজ থেকে উদ্ভূত: প্রতিটি সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত বাস্তব কারণ থাকে। এ কারণসমূহ প্রধানত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। সম্পদের অপ্রতুলতা ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা থেকে সামাজিক সমস্যা জন্মলাভ করে।

৭। স্থায়িত্ব: সামাজিক সমস্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর স্থায়িত্ব। সামাজিক সমস্যা চিরস্থায়ী না হলেও একটানা এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। ক্ষণস্থায়ী এবং অনিয়মিত কোনো সামাজিক বিপর্যয় বা দুর্ঘটনাকে সামাজিক সমস্যা বলা যায় না।

সামাজিক সমস্যার কারণ (Causes of social problems)

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যা যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি এর কারণও বহুমুখী। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কতগুলো কারণ এখানে উল্লেখ করা হলো:

১। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা: বাংলাদেশ প্রায় দু'শ পনর বছর পরাধীন ছিল। ফলে আর্থ-সামাজিক জীবনে যে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ইত্যাদি মূলত দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার ফসল।

২। মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণ: বাংলাদেশে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। ২০১৬ সালেও দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র, যাদের পক্ষে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ অসম্ভব। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অভাবে সমাজে নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ জনসংখ্যা স্ফীতি। বাংলাদেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি এবং তা দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। ফলে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, নিরক্ষরতা ইত্যাদি সমস্যা নিরসন কঠিন হয়ে পড়ে।

৪। প্রাকৃতিক দুর্যোগ: অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, নদীর ভাঙ্গন, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগে প্রতি বছরই দেশের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সমাজে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৫। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন: অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সমাজ জীবনে নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা দেখা দেয়। কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি, বস্তিসমস্যার মূলে রয়েছে অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন।

৬। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা: স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ-মৌলবাদী অপতৎপরতা বেড়ে যায়।

৭। সমস্যার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও প্রতিক্রিয়া: একটি সমস্যা অপর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্য সমস্যাকে জটিল করে তোলে। যেমন, দারিদ্র্যের ফলে নিরক্ষরতাসহ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তেমনি নিরক্ষরতা ও অন্যান্য সমস্যাও দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ।

৮। সম্পদের অসম বণ্টন: বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান অনেক বেশি। সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

৯। অপসংস্কৃতির প্রভাব: আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং মুক্ত গণ্যমাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সংস্কৃতিতে অপসংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব পড়েছে। ফলে আমাদের কিশোর ও তরুণ সমাজের অনেকে বিপথগামী হচ্ছে।

১০। আন্তর্জাতিক চক্র: অস্ত্র, মাদক ও স্বর্ণ চোরাচালানের আন্তর্জাতিক চক্র বাংলাদেশকে রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদের অপচেষ্টায় বাংলাদেশও মাদকের বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। আন্তর্জাতিক চক্রের প্রভাবে বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার, মানব পাচারসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১১। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার: বাংলাদেশে এখনো প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর (বিবিএস- এমএসভিএসবি রিপোর্ট ২০১৭)। দেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অজ্ঞ, অসচেতন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এ কারণে স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, যৌতুক প্রথাসহ বহু সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সামাজিক সমস্যার কারণগুলো চিহ্নিত করুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সমাজের এক অনিবার্য বাস্তবতা হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। উন্নত কিংবা দরিদ্র, শিক্ষিত কিংবা নিরক্ষর, আধুনিক কিংবা অনগ্রসর যেকোনো সমাজেই সামাজিক সমস্যার অস্তিত্ব রয়েছে। তবে সময় ও স্থানভেদে সমস্যার ধরন ও প্রকৃতি আলাদা। আবার অনেকে সময় একটি সমস্যা নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন অধিক জনসংখ্যা কিংবা দারিদ্র্য আরো অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। বস্তুত সামাজিক সমস্যার কারণ বহুমুখী। এর সমাধানে নিতে হবে সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি সামাজিক সমস্যা নয়।

(ক) দারিদ্র্য (খ) বাল্যবিবাহ

(গ) বিদ্যুৎসঙ্কট (ঘ) নিরক্ষরতা

২। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের কত শতাংশ মানুষ হতদরিদ্র?

(ক) ১১.৯ শতাংশ (খ) ১৩ শতাংশ

(গ) ১৩.৯ শতাংশ (ঘ) ১৪.৯ শতাংশ

৩। বাংলাদেশে একাধিক সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ি কোনটি?

(ক) নিরক্ষতা (খ) দারিদ্র্য

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘ) অধিক জনসংখ্যা

পাঠ-১৩.২ দারিদ্র্য
Poverty

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দারিদ্র্যের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- দারিদ্র্যের ধরনগুলো লিখতে পারবেন;
- দারিদ্র্যের কারণ এবং দারিদ্র্য নিরসনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দারিদ্র্য।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি ব্যাপক ও জটিল সামাজিক সমস্যা। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনের কোনোদিকই এর কবল থেকে মুক্ত নয়। দারিদ্র্য নিরসন করা সম্ভব না হলে আমাদের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা (Definition of poverty)

দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থনীতির একটি নেতিবাচক অবস্থা। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, অসচ্ছলতা ও অক্ষমতা হলো দারিদ্র্য। আভিধানিক অর্থে, 'দারিদ্র্য' বলতে অভাব বা অনটনকেই বুঝায়। দারিদ্র্য মানে মৌলিক সামর্থ্যের অভাব। ন্যূনতম খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা মানুষের মৌলিক সামর্থ্যের অন্তর্ভুক্ত। আয়ের স্বল্পতা, জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থতা, নিরাপত্তাহীনতা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগের অভাবের মাধ্যমে দারিদ্র্যের প্রকাশ ঘটে।

দারিদ্র্য পরিমাপে এবং এর স্বরূপ বিশ্লেষণে 'দারিদ্র্য সীমা' ধারণাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বব্যংকের Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality প্রতিবেদনে দৈনিক যাদের উপার্জন ১.৯ মার্কিন ডলারের (১৫২ টাকা) কম তাদেরকে দরিদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী গিলিনের মতে, "দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যাতে কোনো ব্যক্তি তার সমাজের অন্যদের সমমানে জীবন যাপন করতে পারে না এবং সে কারণে কার্যকর সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা এবং দক্ষতা অর্জনে অক্ষম।"

একটি দারিদ্র্য পীড়িত সমাজে কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন: ক্ষুধার্ত মানুষ আছে, তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য নেই; মানুষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র, মানসম্মত বাসস্থান নেই; রোগাক্রান্ত মানুষ আছে, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা/সক্ষমতা নেই; কর্মক্ষম মানুষ আছে, তাদের কর্মসংস্থান নেই; বাজার আছে, ব্যবসায়ের পুঁজি নেই; দুর্যোগ মোকাবিলার ব্যবস্থা নেই, কথা বলার মানুষ আছে, বাকস্বাধীনতা নেই; দেশে সম্পদ আছে কিন্তু এর যথাযথ ব্যবহার নেই। সার্বিক বিচারে সম্পদ, শিক্ষা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চনা ও বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে দারিদ্র্য। বস্তুত দারিদ্র্য কেবল আর্থিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত নয়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা হচ্ছে দারিদ্র্য।

দারিদ্র্যের ধরন (Types of poverty)

সংজ্ঞা অনুসারে দারিদ্র্যকে তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে: (১) সাধারণ অর্থে দারিদ্র্য, (২) আপেক্ষিক দারিদ্র্য এবং (৩) চরম দারিদ্র্য।

১। সাধারণ অর্থে দারিদ্র্য (General poverty)**:** সাধারণ অর্থে দারিদ্র্য হচ্ছে অর্থনীতির এমন একটি পর্যায় বা অবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা পরিবার কোনোমতে তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম হয়। দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদার অতিরিক্ত কিছু তারা মেটাতে পারে না বা সচ্ছল জীবনযাপন করতে সক্ষম হয় না।

২। আপেক্ষিক দারিদ্র্য (Relative poverty)**:** সমাজের অন্যদের অপেক্ষা অনগ্রসর বা নিম্নতর আর্থিক অবস্থাকে আপেক্ষিক

দারিদ্র্য বলা হয়। উন্নত জীবনযাপনের উপকরণ সংগ্রহের আর্থিক ক্ষমতার তারতম্য হল আপেক্ষিক দারিদ্র্য। যেমন: একজন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বাস করে; অপরজনের ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা আছে, এর বেশি তার সঙ্গতি নেই। এখানে দ্বিতীয়জন প্রথমজন অপেক্ষা দরিদ্র। আবার পঞ্চাশ বছর আগে বাংলাদেশের দারিদ্র্য এবং বর্তমানের দারিদ্র্যের রূপ এক নয়। তেমনি কোনো উন্নত দেশের দারিদ্র্য আর বাংলাদেশের দারিদ্র্যেও ভিন্নতা রয়েছে। এটিও আপেক্ষিক দারিদ্র্য।

৩। চরম দারিদ্র্য (Absolute poverty)**:** চরম দারিদ্র্য বলতে এমন একটি আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে মানুষ মৌলিক চাহিদাসমূহ সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে না। চরম দরিদ্র মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়েজানীয় সম্পদ, সক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকে না। এমনকি চরম দরিদ্র মানুষ দৈনিক ১৫০ টাকা উপার্জন করতে পারে না। চরম দারিদ্র্যের পরবর্তী স্তর হল নিঃস্বতা। নিঃস্ব মানুষের অবলম্বন ভিক্ষাবৃত্তি।

শিক্ষার্থীর কাজ	দারিদ্র্যের ধরনগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। দারিদ্র্য হচ্ছে মানুষের সুযোগ, সক্ষমতা ও স্বাধীনতার অভাব। দারিদ্রের কারণে মানুষ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। দারিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, খাদ্য, পুষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি করে। দারিদ্র্যের কয়েকটি ধরন রয়েছে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ দারিদ্র্য, আপেক্ষিক দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দৈনিক কত টাকার কম উপার্জন করলে তাকে হতদরিদ্র বলা হয়?

(ক) ৯০ টাকার কম (খ) ১০০ টাকার কম

(গ) ১২৫ টাকার কম (ঘ) ১৫০ টাকার কম

২। দারিদ্র্য প্রধানত কয় ধরনের/কয় স্তরের?

(ক) দুই ধরনের/স্তরের (খ) তিন ধরনের/স্তরের

(গ) চার ধরনের/স্তরের (ঘ) পাঁচ ধরনের/স্তরের

পাঠ-১৩.৩ দারিদ্র্যের কারণ ও দারিদ্র্য নিরসনের উপায়
Causes of poverty and means of poverty alleviation

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দারিদ্র্যের কারণসমূহ বলতে পারবেন;
- দারিদ্র্য নিরসনের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গ্রামীণ দারিদ্র্য, নগর দারিদ্র্য, দারিদ্র্য নিরসনের উপায়।

দারিদ্র্যের কারণ (Causes of poverty)

নানা কারদারিদ্র্য কোনো স্বয়ংসৃষ্ট সমস্যা নয়। ণে একটি দেশ বা সমাজ দারিদ্র পীড়িত হয়। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ প্রায় সোয়া দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন। দীর্ঘকালের শোষণ-বঞ্চনায় বাংলাদেশ যেমন ক্রমশ সম্পদহীন হয়েছে, তেমনি সক্ষমতা অর্জনেও পিছিয়ে পড়েছে। আবার গ্রামীণ ও নগর দারিদ্র্যের কারণ সব সময় এক ও অভিন্ন নয়। এখানে গ্রামীণ ও নগর দারিদ্র্যের কারণগুলো পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল।

গ্রামীণ দারিদ্র্যের কারণ	নগর দারিদ্র্যের কারণ
১। সনাতন কৃষি ব্যবস্থা;	১। শিল্পে অনগ্রসরতা;
২। কৃষি ভূমির স্বল্পতা;	২। চাহিদা ও যোগ্যতানুসারে কর্মসংস্থানের অভাব;
৩। কুসংস্কার ও ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা;	৩। অধিক জনসংখ্যা;
৪। শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;	৪। সম্পদের অসম বণ্টন;
৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগ;	৫। শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;
৬। সম্পদের সদ্ব্যবহারের অভাব;	৬। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা;
৭। কৃষিবহির্ভুত পেশায় কাজের সুযোগের অভাব;	৭। উদ্ভাবনী উদ্যোগের অভাব;
৮। পুঁজি ও উদ্যোগের অভাব; ইত্যাদি।	৮। দরিদ্র্যদের পুনর্বাসনের অভাব; ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় (Way of poverty alleviation in Bangladesh)

গত তিন দশকে বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে চমৎকার সাফল্য দেখিয়েছে। এ সময় দারিদ্র্যের হার ৭০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় ২৫০ ডলার থেকে প্রায় ১৬০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। কৃষির পরিবর্তে জিডিপিতে শিল্পের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, আইসিটিসহ নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে তরুণ জনশক্তির সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এখানে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। সামাজিক গবেষণা: সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সঠিক তথ্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের কার্যকর উপায় বের করতে হবে।

২। কৃষি উন্নয়ন: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখনো কৃষির ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ১৬ কোটি মানুষের এই দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল, শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে কৃষি উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন অপরিহার্য।

৩। শিল্পায়ন: দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য শিল্পায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে যতবেশি শিল্পায়ন হয়েছে সে দেশ ততবেশি উন্নত। শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানুষের আয় বৃদ্ধি দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৪। সেবাখাতের সম্প্রসারণ: বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসনের জন্য সেবাখাতের সম্প্রসারণ অপরিহার্য। পরিবহন, ব্যাংক-বীমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

৫। প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার: বঙ্গোপসাগরে বিরাট মৎস্যভাণ্ডার, দেশের উর্বর ভূমি, জলাশয়, গ্যাসসহ খনিজ সম্পদের

কার্যকর ও সমন্বিত ব্যবহার দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৬। জনশক্তির উন্নয়নঃ দেশের বিপুলসংখ্যক কর্মক্ষম লোকের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে পরিণত করা যায়। দেশে-বিদেশে এদের কর্মসংস্থান হলে দেশের দারিদ্র্য কমবে।

৭। নারীদের কর্মসংস্থানঃ দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। তাদের জন্য শিক্ষা এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে।

৮। হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনঃ হতদরিদ্র ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থান তৈরি করে সমাজের মূলধারায় পুনর্বাসন করা করা হলে তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৯। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিঃ দুস্থ, দরিদ্র, অক্ষম, অসহায় ও বয়স্ক মানুষ এবং দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান ও পুনর্বাসন কর্মসূচি দারিদ্র্য-বিনাসী কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

১০। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণঃ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে।

১১। ক্ষুদ্র ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে সহায়তা প্রদানঃ ক্ষুদ্র ও উদ্ভাবনী উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তরুণদের কর্মসংস্থান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সরকারি ও বেসরকারি সহায়তা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে।

১২। গণতন্ত্র ও সুশাসনঃ ধারাবাহিক ও গতিশীল গণতন্ত্রই পারে দেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত বন্দরে নিয়ে যেতে। সুশাসন, দুর্নীতি প্রতিরোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কার্যকরী কৌশল।

শিক্ষার্থীর কাজ	দারিদ্র্য দূরীকরণে ১০টি সুপারিশ লিপিবদ্ধ করুন	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

যেকোনো সমাজের জন্য দারিদ্র্য একটি জটিল ও বহুমুখী সমস্যা। বিভিন্ন সমস্যা থেকে দারিদ্র্যের উদ্ভব হয় এবং ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করে। আবার দারিদ্র্য সমাজে অনেক সমস্যার জন্ম দেয়। দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শোষণ ও বঞ্চনা, শিল্পে অনগ্রসরতা, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব, অধিক জনসংখ্যা এবং আরো অনেক কারণে দারিদ্র্যের জন্ম হয়। আবার সামাজিক গবেষণা, কৃষির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিল্পের অগ্রসরতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ রাখতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি দারিদ্যের কারণ নয়।

(ক) জলবায়ুর পরিবর্তন (খ) অধিক জনসংখ্যা

(গ) সম্পদের অসম বণ্টন (ঘ) শিল্পে অনগ্রসরতা

২। নিচের কোনটি দারিদ্য নিরসনের উপায় হিসেবে কার্যকর?

(ক) জিডিপি বৃদ্ধি (খ) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

(গ) মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি (ঘ) আধুনিকায়ন

পাঠ-১৩.৪ বেকার সমস্যা
Unemployment problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বেকারত্ব কী তা বলতে পারবেন;
- বেকারত্বের কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বেকারত্ব থেকে মুক্তির উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বেকারত্ব, পূর্ণ বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব, মৌসুমী বেকারত্ব।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সব দেশেরই বেকার সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশেরও অন্যতম সামাজিক সমস্যা হচ্ছে বেকারত্ব। জনসংখ্যার ঘনত্ব, সনাতন কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প ও সেবা খাতের কাঙ্ক্ষিত সম্প্রসারণের অভাব বেকার সমস্যাকে আরো অনিবার্য করে তুলছে। প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে বেকারত্ব দেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বিপুলসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠী দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্থ করছে।

বেকারত্বের সংজ্ঞা (Definition of unemployment)

সাধারণত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের অভাবকে বেকারত্ব বলা হয়। সক্ষম কর্মহীন ব্যক্তি হচ্ছে বেকার। কেউ যদি ইচ্ছাপূর্বক কাজ না করে অলস-অবসর সময় কাটায় তবে তাকে বেকার বলা যায় না। সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থান না হওয়াকে বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা হল বেকারত্ব। পঙ্গু, অক্ষম, কাজ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কর্মহীনতা বেকারত্বের আওতায় পড়ে না।

C. B. Mamoria-এর মতে, "Unemployment is a state of worklessness for a man fit and willing to work, that is a condition of involuntary and not voluntary idleness."

অধ্যাপক পিগুর মতে, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায়, অথচ কাজ পায় না, তখন সে অবস্থাকেই বেকারত্ব বলা হয়।"

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্মক্ষম মানুষ যদি প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজ পায়, তবে তাকে কর্মে নিযুক্ত ধরা যাবে। এর বাইরে যারা পড়েন তারা বেকার, অর্ধবেকার বা ছদ্মবেকার।

সুতরাং বেকারত্ব বলতে এমন এক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে বুঝায়, যেখানে প্রচলিত মজুরিতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কর্মক্ষম জনগণ তাদের যোগ্যতা অনুসারে কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যারা এ বঞ্চনার শিকার তারা হচ্ছে বেকার। উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে বেকারত্বের কতগুলো বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। যেমন: ক) কাজ করার সক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ নেই, খ) প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার আগ্রহ থাকা সত্বেও কাজ না পাওয়া, গ) কর্মসংস্থানের অভাব থাকা, ঘ) প্রয়োজন থাকা সত্বেও কাজের সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি।

বেকারত্বের প্রকারভেদ (Types of unemployment)

বেকারত্ব বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন:

১। **পূর্ণ বেকারত্ব:** কর্মসংস্থানের অভাবে সম্পূর্ণ কর্মহীন অবস্থা হলো পূর্ণ বেকারত্ব। পূর্ণ বেকাররা বেঁচে থাকার জন্য অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

২। **আংশিক/খণ্ড বেকারত্ব:** এ শ্রেণির বেকাররা পূর্ণকালীন, অর্থাৎ দৈনিক ৮ ঘণ্টা হারে স্থায়ী কোনো কাজ পায় না।

৩। **মৌসুমী/সাময়িক বেকারত্বঃ** এ শ্রেণির লোকেরা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে কাজ করে, অন্য সময়ে কাজের অভাবে বেকার থাকে।

৪। **প্রচ্ছন্ন/ছদ্ম বেকারত্বঃ** কোনো কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমশক্তি নিয়োজিত থাকলে সে অতিরিক্ত শ্রমশক্তির নিয়োগকে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলা হয়। কারণ সেখানে নিযুক্ত শ্রমশক্তি অনুপাতে কাজের যোগান থাকে না।

৫। **প্রযুক্তিজনিত বেকারত্বঃ** প্রযুক্তির উন্নতিতে অনেক পণ্যের চাহিদা থাকে না। আবার প্রযুক্তির ব্যবহারে পেশারও পরিবর্তন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কিছু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। এটিই প্রযুক্তিজনিত বেকারত্ব।

৬। **নৈমিত্তিক বেকারত্বঃ** হঠাৎ উদ্ভূত কোনো কারণে শ্রমশক্তির চাহিদা কমে গেলে কিংবা কোনো প্রকল্পের কাজ শেষ হয়ে গেলে যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তা হল নৈমিত্তিক বেকারত্ব।

বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণ ও প্রতিকার (Causes and Means to solve unemployment in Bangladesh)

বাংলাদেশের বেকারত্ব একদিনে কোনো একটি বিশেষ কারণে সৃষ্টি হয়নি। এর জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অবস্থা বিশেষভাবে দায়ী। নিম্নে বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণ এবং প্রতিকার তুলে ধরা হলঃ

বেকারত্বের কারণ	বেকারত্বের প্রতিকার
১। কৃষির উপর নির্ভরশীলতা;	১। কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ;
২। দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা;	২। অর্থনৈতিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ;
৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধি;	৩। কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৪। কুটির শিল্পের অবলুপ্তি;	৪। শিল্পায়ন এবং সেবাখাতের সম্প্রসারণ;
৫। চাকরির মোহ;	৫। উৎপাদন ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি;
৬। বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব;	৬। নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থান;
৭। নিরক্ষরতা ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব;	৭। জনশক্তি রপ্তানিতে কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান;
৮। জনশক্তি রপ্তানিতে দুর্নীতি ও অদক্ষতা;	৮। প্রযুক্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার;
৯। নারী কর্মসংস্থানের অভাব;	৯। ক্ষুদ্র এবং উদ্ভাবনীমূলক উদ্যোগে সহায়তা প্রদান
১০। ঘরমুখো স্বভাব ইত্যাদি।	১০। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বেকারত্বের কারণগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

কর্মক্ষম মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার চেষ্টা করেও যদি কাজের সুযোগ না পায় তবে তাকে বেকারত্ব বলে। বেকারত্ব অতীতে যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে। বেকারত্বের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে পূর্ণবেকারত্ব, খণ্ডবেকারত্ব, ছদ্মবেকারত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিক জনসংখ্যা, কৃষির উপর নির্ভশীলতা, শিল্পায়নের অভাব, শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার অভাব ইত্যাদি কারণে বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন বয়সের মানুষকে কর্মক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়?
(ক) ১৮ থেকে ৬০ বছর (খ) ১৫ থেকে ৪৫ বছর (গ) ১৬ থেকে ৫০ বছর (ঘ) ২০ থেকে ৬৫ বছর

২। বেকারত্ব প্রধানত কয় প্রকার?
(ক) চার প্রকার (খ) পাঁচ প্রকার (গ) ছয় প্রকার (ঘ) সাত প্রকার

৩। বেকারত্ব দূরীকরণের সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটি?
(ক) শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা (খ) দারিদ্র্য বিমোচন
(গ) পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা (ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা

পাঠ-১৩.৫ জনসংখ্যা সমস্যা
Population problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	জনসংখ্যা সমস্যা।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

কোনো দেশ বা সমাজের প্রধান উপাদান হচ্ছে জনসংখ্যা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনিবার্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেদিক থেকে যেকোনো সমাজের জন্য জনসংখ্যা অপরিহার্য। কিন্তু এ জনসংখ্যাই আবার একটি সমাজ বা দেশের জন্য সমস্যা বলে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুত জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা। আবার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়। দক্ষ জনসম্পদ একটি সমাজের আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মানব সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি দেশের সম্পদ ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা যদি প্রয়োজনের তুলনায় কম বা বেশি হয় তাহলে সেখানে জনসংখ্যা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা কী (What is population problem)

সাধারণভাবে জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কোনো দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও চাহিদার তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হওয়া। জনসংখ্যা তখনই সমস্যা যখন এটি কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত *'An Essay on the Principle of Population'* প্রবন্ধে বলেন, "কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশি হলে তা জনসংখ্যা সমস্যা বা জনসংখ্যাস্ফীতি বলে।" তিনি আরও বলেন, "By nature human food increases in a slow arithmetical ratio. যেমন: ১, ২, ৩, ৪, ৫ হারে। But man himself increases in a quick geometrical progress on. যেমন: ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ হারে।" মূলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে একটি সামাজিক সমস্যা। এর ফলে একটি দেশের মোট সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য থাকে। অধিক জনসংখ্যা দেশের আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তবে কেবল জনসংখ্যার আধিক্যই সমস্যা সৃষ্টি করে না, কোনো দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যাও সমস্যার কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশে জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি তাই সেখানে জনসংখ্যাস্ফীতিই অন্যতম সামাজিক সমস্যা। অন্যদিকে কানাডা, জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক কম। ফলে এসব দেশে জনসংখ্যার স্বল্পতাই জনসংখ্যা সমস্যা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি (Population situation in Bangladesh)

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। আয়তনের তুলনায় দেশটির জনসংখ্যা অনেক বেশি। বিশ্বের অষ্টম এবং এশিয়ার পঞ্চম জনবহুল দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। ষাটের দশকের আগে এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক ছিল। তবে এরপর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। নিচে গত পঞ্চাশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৬১-২০১৬)

(উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)

আদমশুমারির সন	মোট জনসংখ্যা	মোট বৃদ্ধি	বৃদ্ধির শতকরা হার
১৯৬১	৫,৫২,২২,৬৬৩	১,১০,৫৬,৯২৩	২.২৬
১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২,১১,৭৫,৩৩৭	২.৪৮
১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	১,৩৫,১৪,০০০	২.৩৫
১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২,১৫,৪৩,১৮৫	২.১৭
২০০১	১২,৯২,৪৭,২৩৩	১,৬৮,৪৬,২৫৪	১.৪৭
২০১১	১৪,৯৭,৭০,০০০	২,০৫,২২,৭৬৭	১.৩৭
২০১৬	১৬,১৭,৫০,০০০*	১,১৯,৮০,০০০	১.৩৭

** ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে প্রাক্কলিত জনসংখ্যা (এমএসভিএসবি) রিপোর্ট ২০১৭, বিবিএস)*

১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করে ১০১৫ জন। বর্তমানে এ হার প্রায় ১১০০ জনকে ছাড়িয়েছে। এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। স্বল্পয়াতনের এ দেশে বিপুল জনসংখ্যা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নানা সমস্যা তৈরি করে। আবার জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব হলে দেশের উন্নয়নের চাকা আরো সচল হতে পারে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ (Causes of population explosion)

যেকোনো দেশের জনসংখ্যার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে তা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মানুষের জৈবিক আন্তঃক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক, ধর্মীয় ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ বিশেষভাবে সম্পর্কিত। এখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। ভৌগোলিক কারণ: ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। ফলে এ দেশের মানুষ কম বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে, যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

২। খাদ্যাভ্যাস: বাংলাদেশের মানুষ শ্বেতসার ও আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন ভাত, গম, আলু, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি গ্রহণে অভ্যস্ত। এ ধরনের খাবার মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব অনস্বীকার্য।

৩। জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান: জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য এবং মানুষের সচেতনতার ফলে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুহার যেমন হ্রাস পেয়েছে, তেমনি মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ: একজন নারী প্রজননক্ষম বয়সের পুরোটাই দাম্পত্য জীবনে অতিবাহিত করলে তার অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার সুযোগ অনেক বেশি। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে এবং একাধিক বিয়ে হয় তাহলে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৫। দারিদ্র্য: দরিদ্র মানুষের বিনোদনের ব্যবস্থা কম। স্বামী-স্ত্রীর যৌনতাই তাদের প্রধান বিনোদন। ডি ক্যাস্ট্রো বলেন, "ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি"। বাংলাদেশেও দরিদ্র মানুষ অধিক সন্তান জন্ম দেয়।

৬। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও সচেতনতার অভাব: বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ নিরক্ষর, অজ্ঞ, অসচেতন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব ও কুফল সম্পর্কে তাদের ধারণাও সীমিত। ফলে তারা অধিক সন্তান জন্ম দেয়।

৭। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার: জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বা জন্মনিয়ন্ত্রণকে অনেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ পরিপন্থী বলে মনে করে। "মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দিবেন তিনি" এ ধরনের মূল্যবোধ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৮। পুত্র সন্তান লাভের ইচ্ছা: বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় অনেকের কাছে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব বেশি। ফলে পুত্র সন্তান লাভের আশায় অনেকে ৩/৪ টি কন্যাসন্তানের পর ৫ম সন্তান জন্ম দিচ্ছে– যা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে।

৯। নারী শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবঃ বাংলাদেশে শিক্ষিত, সচেতন এবং কর্মজীবী নারীর সংখ্যা এখনো অপ্রতুল। ফলে তাদের অনেকেরই অল্প বয়সে বিয়ে হয়। সচেতনতা ও সক্ষমতার অভাবে তারা বেশি সন্তানের জন্ম দেয়।

১০। চিত্তবিনোদনের অভাবঃ দেশে স্বল্প কিংবা বিনা খরচে সুস্থ বিনোদনের অভাব রয়েছে। ফলে দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষ যৌন সম্পর্কক স্থাপনকেই তাদের চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

১১। নারীর শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের অভাবঃ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে নারীর শিক্ষা, সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের অভাব। অধিক সন্তান ধারণ ও জন্মদানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অনেক নারী সচেতন নন। আবার জন্ম-নিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও অনেক নারী স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো চিহ্নিত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যার নাম অধিক জনসংখ্যা। বস্তুত স্বল্পায়তনের এ দেশে ১৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বাল্যবিবাহসহ আরো অনেক সামাজিক সমস্যা তৈরি করছে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অসচেতনতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি কারণে দেশের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে/পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'খাদ্য উৎপাদন বাড়ে গাণিতিক হারে আর জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক হারে' কে বলেছেন?

(ক) টমাস ম্যালথাস (খ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

(গ) কার্ল মার্কস (ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

২। ২০১১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী দেশের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত জন মানুষ বাস করে?

(ক) ৯৩৫ জন (খ) ১০১৫ জন

(গ) ১১০০ জন (ঘ) ১১৫০ জন।

৩। "ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি" কে বলেছেন?

(ক) টমাস ম্যালথাস (খ) সিগমুন্ড ফ্রয়েড

(গ) ডি ক্যাস্ট্রো (ঘ) বিল গেটস্

পাঠ-১৩.৬ অধিক জনসংখ্যার প্রভাব
Impact of over population

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যার প্রভাব লিখতে পারবেন;
- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অধিক জনসংখ্যা প্রভাব, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

বর্তমানে বিশ্বের খুব কম দেশেই কাম্য জনসংখ্যা রয়েছে। কিছু দেশে প্রয়োজনের তুলনায় কম জনসংখ্যা থাকলেও অধিকাংশ দেশে জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। জনসংখ্যাস্ফীতির পরবর্তী পর্যায়কে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। জনসংখ্যা বিস্ফোরণের ভয়াবহতা সম্পর্কে ১৯৭৭ সালে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা বলেছিলেন, "পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে অন্যতম যে গুরুতর সমস্যা, তা হচ্ছে জনসংখ্যাস্ফীতি।" ম্যাকনামারার এ বক্তব্যের বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে চাপ: ১৬ কোটি মানুষের এদেশে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.২০ একর। বস্তুত স্বল্পায়তনের এ দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়া খুব সহজ কাজ নয়। অধিক ও বহুমুখী উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি সাময়িকভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হলেও বাংলাদেশে খাদ্যের উপর বাড়তি চাপ একটি অনিবার্য বাস্তবতা।

২। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে ঘাটতি: বিপুল জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশেরই বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তাদের সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য প্রায়ই অপুরণীয় থেকে যায়।

৩। দারিদ্র্য: বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দরিদ্র্য, এর মধ্যে হতদরিদ্র হচ্ছে প্রায় ১৭.৬ শতাংশ মানুষ (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৬)। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে জনসংখ্যাস্ফীতি। অধিক মানুষের শিক্ষা, দক্ষতার অভাবে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান হয় না। তাদের জীবনমান নিম্নমুখী এবং মৌলিক চাহিদাও থেকে যায় অপূর্ণ। ফলে আয়তনের তুলনায় অধিক জনসংখ্যাই বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান অন্তরায়।

৪। বেকারত্ব বৃদ্ধি: বাংলাদেশে কর্মক্ষম যুবকের একটি বড় অংশ (প্রায় ২৬ লক্ষ যুবক) প্রত্যাশিত কাজ থেকে বঞ্চিত। দেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। অধিক জনসংখ্যাই বেকারত্বের প্রধান কারণ।

৫। দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে সমস্যা: কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ অধিকতর ব্যয়বহুল এবং সুযোগও সীমিত। ফলে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে আধুনিক ও কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা সত্যিই কঠিন।

৬। গৃহহীন ভাসমান মানুষের সংখ্যাধিক্য: ১৬ কোটি মানুষের সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা দুঃসাধ্য। শিল্পায়ন ও নগরায়ন প্রতিনিয়ত গ্রামের মানুষকে শহরমুখী করছে। কিন্তু তাদের জন্য প্রত্যাশিত কাজ এবং নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ফলে শহরে বস্তি এবং ভাসমান মানুষের সংখ্যা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। চিকিৎসা সেবায় নাজুকতা: দেশের ১৬ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার জন্য দক্ষ জনবল, অবকাঠামো, আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৮। আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে: বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রতি বছর বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর পরিমাণ আবাদি জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার জমি ভাগ

বাটোয়ারার কারণে জমির খণ্ডায়ন হচ্ছে। ফলে প্রতিনিয়ত আবাদি জমি হ্রাস পাচ্ছে।

৯। পরিবেশ বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা: অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বাড়িঘর নির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিপুল যানবাহন, গাছপালা কর্তন ও বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। মানুষের বিপুল চাহিদা অপরিকল্পিত শিল্পায়নকে উৎসাহিত করছে। মানুষের লোভ ও অসচেতনতায় বিলুপ্ত হচ্ছে বন্যপ্রাণি ও পশুপাখি। ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০। সামাজিক বিশৃঙ্খলা: জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদ ও সুযোগ বৃদ্ধি পায় না। ফলে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে সৃষ্টি হয় বাড়তি প্রতিযোগিতা। পরিণতি হিসেবে দেখা যায়, পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, কলহ-বিবাদ, খুন, মারামারি, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, হতাশা, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি।

১১। যাতায়াত ব্যবস্থায় অত্যধিক চাপ: অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার ইত্যাদিতে স্বাভাবিক চলাচল দিন দিন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা এবং সড়ক-মহাসড়কগুলো বিপুল জনসংখ্যার চাপ নিতে পারে না। ফলে মানুষকে অসহনীয় ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায়

এখন বিশ্বের অনেক দেশই অধিক জনসংখ্যাকে আর সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করছে না। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। বাংলাদেশেও জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের নানা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত বাংলাদেশের দ্রুত উন্নয়ন বা 'উন্নয়ন-মিরাকল'র মূলে রয়েছে বিশাল জনশক্তি। দেশের অভ্যন্তরে পোশাক শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে বিশাল শ্রমশক্তি এবং বিদেশে কর্মরত প্রায় ৮০ লক্ষ কর্মজীবীর প্রেরিত রেমিট্যান্স দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করছে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র প্রকল্প, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র (এমডিজি) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)- এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দারিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে নানারকম সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচি একদিকে যেমন দারিদ্র্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে, তেমনি নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করছে। ফলে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশাল শ্রমশক্তি আগামী এক দশকে দেশের চেহারা পাল্টে দিবে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের অনেকগুলো উপায় রয়েছে। যেমন:

ক) তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা;
খ) কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার;
গ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
ঘ) উদীয়মান শিল্প-কারখানার সাথে সঙ্গতি রেখে মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;
ঙ) পোশাক শিল্পের জন্য দক্ষ ডিজাইনার ও প্রশিক্ষিত কারিগর তৈরি করা;
চ) দেশব্যাপী কারিগরী কলেজ, ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা এবং তরুণদেরকে চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
ছ) শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত সবার জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরি করা।
জ) প্রশিক্ষণ, স্বল্পসুদে ঋণদান এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোশকতা দিয়ে দেশের লাখ লাখ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করা; যারা কেবল নিজেদের নয়, অন্যেরও কাজের ব্যবস্থা করে দিবেন।

একটি দেশের অধিক জনসংখ্যা যদি জনসম্পদে রূপান্তরিত হয় তবে সেখানে আর জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নয়। বরং রূপান্তরিত জনসম্পদ দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। কেবল দক্ষ জনসম্পদ তৈরি নয়, জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে কাম্য জনসংখ্যার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের পাঁচটি উপায় লিখুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে বিশ্বের অনেক দেশেই জনসংখ্যা কোনো সমস্যা নয়। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করা যায়। সবার জন্য কর্মসংস্থান তৈরি হলে কেউ আর সমাজের বোঝা নয়। সবাই মিলেই দেশ ও সমাজের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ কত একর?

(ক) ২.০০ একর (খ) ২০০ একর

(গ) ২০.০০ একর (ঘ) ০.২০ একর

২। বাংলাদেশে (২০১৬) মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ দরিদ্র এবং হতদরিদ্র?

(ক) ৫০ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ (খ) ৩২ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ

(গ) ৩১.৫ শতাংশ এবং ১৭.৬ শতাংশ (ঘ) ২০ শতাংশ এবং ০৮ শতাংশ

৩। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটি?

(ক) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (খ) কারিগরী ও কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার

(গ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি (ঘ) শিল্পায়ন

পাঠ-১৩.৭ মাদকাসক্তি
Drug addiction

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মাদকাসক্তি এবং এর উপসর্গ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মাদকাসক্তির কারণ এবং প্রতিরোধের উপায় নির্দেশ করতে পারবেন;
- সমাজে মাদকাসক্তির প্রভাব ব্যাখা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মাদকাসক্তি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

মাদকাসক্তি সমাজের জন্য এক অভিশাপ। কোনো পরিবারে মাদকাসক্ত ব্যক্তির উপস্থিতি থাকলে কেবল তারাই এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে। মাদকাসক্তি একটি সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ডেকে আনতে পারে। তরুণ সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে তারা তাদের কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। তখন আর ওই সমাজ সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। ফলে যেকোনো সমাজের জন্যই মাদকাসক্তি একটি সমস্যা। এর থেকে উত্তরণের জন্য সামাজিক সচেতনতা ও সরকারি-বেসরকারি প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

মাদকাসক্তি কী (What is drug addiction)

মাদক দ্রব্যের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে মাদকাসক্তি। বিভিন্ন ব্রান্ডের তরল মদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের হিরোইন, ইয়াবাসহ এলকোহল সমৃদ্ধ যে কোনো দ্রব্যের প্রতি অনিয়ন্ত্রিত আসক্তি বা আগ্রহকে মাদকাসক্তি বলে। গাঁজা, চরস যেমন নেশাদ্রব্য হিসেবে পরিচিত এবং ব্যবহৃত হয় তেমনি ফেনসিডিলসহ কিছু ঔষধও নেশাদ্রব্য হিসেবে বহুলপ্রচলিত। পথশিশু বা বস্তির দরিদ্র ছেলে-মেয়েরা অনেকসময় পলিথিনের মধ্যে জুতার আঠা লাগিয়ে নেশা করে। টিকটিকির লেজ পুড়িয়েও নেশার কথাও শোনা যায়। উপকরণ যা ই হোক না কেনো, কোনো কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী কিংবা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নেশাদ্রব্য গ্রহণের বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাকে মাদকাসক্তি বলে অভিহিত করা যায়। মাদকদ্রব্যে আসক্ত ব্যক্তি একসময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং অস্বাভাবিক আচরণ করে। সাধারণত যে যে দ্রব্যে আসক্ত হয়, সে ওই দ্রব্যটি গ্রহণেই তৎপর থাকে। মাদকে আসক্ত ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট উপকরণের পাশাপাশি প্রায়শ সময়, স্থান এমনকি সঙ্গীও নির্দিষ্ট থাকে।

কোনো ব্যক্তি মাদকে আসক্ত হয়ে পড়লে তার মধ্যে কিছু উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়। পরিবার ও বন্ধু-স্বজনদের সচেতন পর্যবেক্ষণে এসব উপসর্গ ধরা পড়ে। যেমন:

০১) ক্ষুধামন্দা, খাবারে অরুচি ও অনীহা;
০২) রাতজাগা, সকালে অধিকবেলা পর্যন্ত ঘুমানো,;
০৩) স্বাস্থ্যহানী এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া;
০৪) স্বাভাবিকের তুলনায় অধিক হাত-খরচ বা যেকোনো উপায়ে বেশি বেশি টাকা নেয়া;
০৫) নেশাগ্রস্থ বন্ধুদের সাথে উঠা-বসা, আড্ডা, সময় কাটানো;
০৬) বেশি রাতে বাড়ি ফেরা, বাড়ির বাইরে অনেক বেশি সময় অবস্থান করা;
০৭) নির্জীব এবং ঝিমমেরে থাকা
০৮) স্বাস্থ্য-চেহারার প্রতি উদাসীনতা;
০৯) লেখাপড়া, পরিবার ও অফিসের কার্যক্রমে অনীহা
১০) সবার সাথে মেলামেশায় স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির কারণ এবং প্রতিরোধের উপায়

মাদকাসক্তির অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যেমন:

১) **সঙ্গী-সাথীর প্রভাব:** কিশোর-কিশোরী কিংবা তরুণ-তরুণীর মাদকাসক্তির প্রধান কারণ হচ্ছে মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গী-সাথী। মাদক কোথায় পাওয়া যায়, কীভাবে সেবন করে ইত্যাদি বন্ধু-সাথীদের থেকেই জানা যায়।

২) **কৌতূহল:** কৌতূহল থেকে অনেকেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, মদ ইত্যাদি সেবন কিংবা পান করলে কেমন লাগে, কী অনুভূতি হয় তা জানার আগ্রহ থেকে অনেকে মাদকের জগতে প্রবেশ করে।

৩) **হতাশা:** অনেকে হতাশা থেকেও মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। পারিবারিক অশান্তি, প্রেমে ব্যর্থতা কিংবা শিক্ষা ও পেশাগত জীবনের হতাশা ভুলতে অনেকে মদের নেশায় ডুবে যায়।

৪) **সহজলভ্যতা:** মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ হচ্ছে মাদকের সহজলভ্যতা। গাঁজা, ইয়াবা, ফেন্সিডিলসহ অনেক মাদকদ্রব্য হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। বিক্রেতারা চাহিদার ভিত্তিতে অনেক সময় ক্রেতার কাছে এগুলো পৌঁছেও দেয়।

৫) **মাদক বাণিজ্য ও পাচার:** মাদক বাণিজ্য ও পাচারের মাধ্যমে অনেকে রাতারাতি কোটিপতি হয়েছেন। দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য অনেকে মাদক বাণিজ্য ও পাচারের যুক্ত হয়। এর প্রভাব পড়ে যুবসমাজের উপর। তারা সহজে মাদক পেয়ে যায়।

৬) **পরিবারের উদাসীনতা:** পরিবারের অসচেতনতা ও উদাসীনতা সন্তানদেরকে মাদকাসক্ত করে তুলতে পারে। বাবা-মা দু'জনই যদি অনেক বেশি ব্যস্ত থাকেন তবে সন্তানকে সময় দিতে পারেন না। বিত্তশালী পরিবার প্রায়শ সন্তানের হাতে পর্যাপ্ত টাকা তুলে দেন। বাড়তি টাকা সন্তানকে নেশার জগতে ঠেলে দিতে পারে।

৭) **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির অভাব:** মাদক আমদানী, পাচার, পরিবহন, মজুদ, সংরক্ষণ, বিপনন, অপ্রাপ্তদের মাদক সেবন ইত্যাদি বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারির অভাব রয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরেরও কার্যকর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। ফলে মাদকের বিস্তার ঘটে।

৮) **মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞতা:** কিশোর-তরুণদের অনেকেই মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানে না। মজা করতে করতে কৌতূহলবশত তারা মাদকের অন্ধকার জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু এটি ধীরে ধীরে ধ্বংস এবং মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়– এ বিষয়ে তাদের অনেকেই সচেতন নয়।

৯) **মুক্ত গণমাধ্যম ও আকাশ-সংস্কৃতির প্রভাব:** প্রচলিত টিভি-সিনেমা ছাড়াও এখন ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টগ্রামে দেশি-বিদেশি নাটক-সিনেমা, সিরিয়াল, পর্ণোছবি ইত্যাদি অনেক সহজলভ্য। এগুলোর প্রভাবে অনেকে মাদকের জগতে প্রবেশ করে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে তা হচ্ছে: ১) পরিবারের সচেতনতা, সতর্কতা ও সন্তানদের প্রতি দায়িত্বশীলতা, ২) মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা, ৩) বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা, ৪) মাদকের উৎস নিয়ন্ত্রণ, ৫) আইনের কঠোর প্রয়োগ ইত্যাদি।

সমাজে মাদকাসক্তির প্রভাব (Impact of drug addiction in society)

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক সমস্যা। সমাজে মাদকাসক্তির বহুমুখী বিরূপ প্রভাব রয়েছে। বস্তুত মাদকাসক্তির কোনো সুফল নেই; কেবলই ক্ষতিকর প্রভাব। এখানে সমাজে মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

০১) **পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়:** মাদকাসক্ত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজের কারো সাথেই সুন্দর, সাবলিল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারে না। তারা খিটখিটে স্বভাবের হয়, তুচ্ছ ঘটনায় রেগে যায় এবং নির্জনে একাকি থাকতে পছন্দ করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।

০২) **অশান্তি তৈরি হয়:** যে পরিবারে একজন মাদকাসক্ত রয়েছে সে পরিবারে শান্তি বা স্বস্তি বলে কিছু থাকে না। মাদকাসক্তের মাতলামি, বেপরোয়া মনোভাব, টাকার জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণ পরিবার ও প্রতিবেশীর শান্তি বিনষ্ট করে। নেশার টাকার জন্য চুরি, ছিনতাই, পরিবারের সদস্যদের মারধোর এমনকি খুনের মত ঘটনাও বিরল নয়।

০৩) **তরুণরা তাদের কর্মক্ষমতা হারায়:** নেশা মানুষকে নির্জীব করে তোলে এবং ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তির কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। কাজে অনিয়মিত, অদক্ষ এবং অক্ষম হওয়ায় মাদকাসক্ত ব্যক্তির পেশাগত ঝুঁকি তৈরি হয়।

০৪) **সমাজের বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়:** কোনো সমাজের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তরুণ মাদকাসক্ত হলে ওই সমাজের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। একজন সুস্থ-সবল স্বাভাবিক মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রে যে অবদান রাখতে পারে, একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি কখনো তা পারে না। ফলে মাদকাসক্তি সমাজের বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে।

০৫) **নানা ধরনের রোগ-ব্যাধি হতে পারে:** ক্যান্সার, লিভার সিরোসিসসহ নানা ধরনের রোগ-ব্যাধির জন্য মাদকাসক্তিকে দায়ী করা হয়। এসব অসুস্থতা জটিল এবং ব্যয়বহুল এমনকি মরণঘাতী। ফলে মাদকাসক্ত একজন মানুষ একটি পরিবারকে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাদকাসক্তির কারণ এবং সমাজে এর প্রভাবগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্তি পরিবার ও সমাজের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। কোনো মানুষ যেকোনো ধরনের নেশাদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তাকে মাদকাসক্তি বলে। মাদকের সহজলভ্যতা, পরিবারের উদাসীনতা, হতাশা-ব্যর্থতা, বেকারত্ব, লাইফ-স্টাইল, মাদক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা, আইনের কঠোর প্রয়োগের অভাব ইত্যাদি মাদকাসক্তির প্রধান কারণ। পরিবার ও সমাজের সচেতনতা, আইনের কঠোর প্রয়োগ ইত্যাদি মাদক নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাদকাসক্তি প্রতিহত করতে না পারলে পরিবার ও সমাজ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি মাদকাসক্তির উপসর্গ?

(ক) আড্ডাবাজ হওয়া (খ) ক্ষুধামন্দা, মেজাজ খিটখিটে হওয়া

(গ) কর্মতৎপরতা (ঘ) অধিক মাত্রায় ঘুমানো

২। মাদকাসক্তির প্রধান কারণ কোনটি?

(ক) অধিক উপার্জন (খ) দারিদ্র্য

(গ) অধিক জনসংখ্যা (ঘ) পরিবারের উদাসীনতা ও সঙ্গী-সাথীর প্রভাব

৩। নিচের কোনটি মাদকাসক্তির প্রভাব?

(ক) নিরক্ষরতা (খ) অপরাধ প্রবণতা

(গ) পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয় ঘ) কুসংস্কার

পাঠ-১৩.৮ দুর্নীতি
Corruption

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- দুর্নীতির সংজ্ঞা ও ধরন সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- দুর্নীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুর্নীতি।

মৌলিক ধারণা (Basic Concept)

সম্পদ আহরণ ও ভোগের প্রবৃত্তি থেকেই জন্ম নেয় দুর্নীতির। মানুষের অনিবার্য মৌলিক চাহিদা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা, লোভ, উচ্চাশা থেকে দুর্নীতির উদ্ভব। এটি একটি মানসিক প্রবৃত্তি। দুর্নীতি সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ। দুর্নীতি দারিদ্র্য ও বৈষম্য বাড়ায় এবং সমাজের ন্যায়নীতিকে বিপন্ন করে তোলে। আমাদের অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় সেবা, মানবাধিকার সর্বত্র দুর্নীতির কালো থাবা। সমাজ ও সংস্কৃতিতে দুর্নীতি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বার বার বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এখনই রুখে না দাঁড়ালে দুর্নীতি আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করবে।

দুর্নীতির সংজ্ঞা (Definition of corruption)

সাধারণ অর্থে দুর্নীতি হচ্ছে সততা ও নীতি-নৈতিকতা (Morality) পরিপন্থী কাজ। ব্যাক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে দুর্নীতি (Abuse of entrusted power for personal gain)। দুর্নীতি প্রায়শ ক্ষমতার সাথে যুক্ত। যে দুর্নীতি করে সে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার অধিকারী। তবে সব ক্ষমতাধর ব্যক্তিই দুর্নীতিবাজ নন। ঘুষ লেনদেন, সম্পদ আত্মসাৎ, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজী, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি দুর্নীতি বলে পরিগণিত।

বস্তুত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি তার বা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করেন তবে তা হবে দুর্নীতি। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যা করার কথা তা না করা কিংবা যা করার কথা নয় তা করাকে দুর্নীতি বলে। বিশ্বের সর্বত্রই কম-বেশি দুর্নীতি ছিলো, আছে এবং হয়ত আগামীতেও থাকবে।

দুর্নীতির ধরন (Types of corruption)

দুর্নীতি প্রধানত দু'প্রকার। যথা:

ক) ক্ষুদ্রকার দুর্নীতি (Petty corruption) এবং খ) বৃহদাকার দুর্নীতি (Grand corruption)

ক্ষুদ্রকার দুর্নীতি হচ্ছে ছোট পরিসরে, স্বল্পমাত্রার দুর্নীতি। সাধারণত দৈনন্দিন প্রয়োজনে স্বল্পমাত্রার ক্ষমতাধারীরা এ ধরনের দুর্নীতিতে যুক্ত থাকে। ক্ষুদ্রাকার দুর্নীতিতে টাকার অঙ্ক যেমন কম থাকে তেমনি এর ক্ষতিকর প্রভাবও খুব বেশি নয়। পঞ্চাশ/একশ থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন বা অর্থ আত্মসাৎ, পরিবার, আত্মীয়-বন্ধুকে ছোট-খাটো চাকরি বা সুবিধা প্রদান, দায়িত্বে অবহেলা, অফিস ফাঁকি ইত্যাদি ক্ষুদ্রাকার দুর্নীতির উদাহরণ।

বৃহদাকার দুর্নীতি হচ্ছে ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ বা নীতিনির্ধারকদের বড় আকারের দুর্নীতি। এ ধরনের দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। এর ক্ষতিকর প্রভাবও অনেক বেশি। সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিবিদ, জায়ান্ট ব্যবসায়ী প্রমুখ বৃহদাকার দুর্নীতির সাথে যুক্ত। সাধারণত কোনো কোম্পানীকে কাজের অনুমতি বা ছাড়পত্র, টেন্ডার, সরকারি কেনাকাটা, সরকারি সম্পদ ইজারা প্রদান, নির্বাচন, ক্ষমতার পালাবদলে কারসাজি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৃহদাকার দুর্নীতি সংঘটিত হয়।

দুর্নীতির কারণসমূহ (Causes of corruption)

দুর্নীতি একটি মানসিক প্রবণতা। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক নানা কারণে মানুষের এ প্রবণতা সক্রিয় হয়ে উঠে। পদ্ধতিগত (Systematic) দুর্বলতাও দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। এখানে দুর্নীতির বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হলো।

১) মৌলিক চাহিদা পূরণে নাজুকতা: দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে ব্যক্তি ও পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে সৃষ্ট নাজুকতা। ক্ষুদ্রায়তনের দুর্নীতির একটি বড় অংশ মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' প্রবাদটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

২) লোভ বা উচ্চাশা: লোভ মানুষের নৈতিকতাকে হত্যা করে। উচ্চাশা মানুষকে বেপরোয়া করে তোলে। বিদ্যমান বেতন, সম্পদ, সম্মান ও অবস্থান নিয়ে অনেকেই সন্তুষ্ট হতে পারেন না। তারা স্বল্প সময়ে সংক্ষিপ্ত উপায়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে কোনোকিছু করতে দ্বিধা করে না। ফলে দুর্নীতির বিস্তৃতি ঘটে।

৩) অন্যের সাথে তুলনা: সহকর্মীদের কেউ কেউ ঝলমলে জীবন-যাপন করেন। তাদের বাড়ি-গাড়ী, গহনা, পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিত্তশালী এসব সহকর্মীদের দ্বারা অন্য অনেকে প্রভাবিত হন। 'অমুক পারলে আমি কেন নয়'? চূড়ান্ত বিচারে দুর্নীতির চর্চা বৃদ্ধি পায়।

৪) পরিবার, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের প্রভাব: স্ত্রীর উচ্চাভিলাষ, স্বামীর লোভ, সন্তানের অবাঞ্ছিত আবদার, পিতা-মাতা কিংবা ভাই-বোনের সীমাহীন চাহিদা ব্যক্তিকে দুর্নীতির দিকে ঠেলে দেয়। নির্দিষ্ট উপার্জন অপেক্ষা অতিরিক্ত, অপ্রত্যাশিত, অবাঞ্ছিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ আয় সম্পর্কে নীরব থাকা দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে।

৫) ক্ষমতার অপব্যবহার: দুর্নীতি মূলত ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত। রাজনীতিবিদ, সরকারের আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, পুলিশ, প্রশাসন, নিরীক্ষা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবাই নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতাবান এসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে দুর্নীতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

৬) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব: স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দুর্নীতির উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে। তথ্য গোপন এবং জবাবদিহিতার অভাব ক্ষমতাবানদের স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। অফিসের দায়দায়িত্ব, মানুষের অধিকার, সরকারি সেবা ইত্যাদি বিষয়ে অবারিত তথ্যের অভাব দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। আবার জনগণ, রাষ্ট্র কিংবা বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা না থাকলে দুর্নীতির অবাধ সুযোগ তৈরি হয়।

৭) আইনের শাসনের অভাব: আইনের শাসনের অভাব দুর্নীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আইন, বিধি-বিধানকে পাস কাটিয়ে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা, বিশেষ কোনো সম্পর্ক দ্বারা শাসন ব্যবস্থা প্রভাবিত হলে সেখানে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।

৮) সুশাসনের অভাব: অবাধ তথ্য প্রবাহ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসনের মূল ভিত্তি। সুশাসনের অভাবে দুনীতির বিস্তার ঘটে। যে দেশ যত বেশি সুশাসনের চর্চা করে তারা তত কম দুর্নীতিগ্রস্থ।

৯) দুর্নীতিবাজদের শাস্তির অভাব: অধিকাংশ দুর্নীতিবাজ খুব চতুর, কৌশলী এবং ক্ষমতাধর। প্রমাণের অভাবে তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা এবং শাস্তি নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। যেকোনো উপায়ে তারা প্রায়ই পার পেয়ে যায়। ফলে দুর্নীতির চর্চা আরো বেড়ে যায়।

১০) দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের অকার্যকারিতা: দুর্নীতি দমন কমিশন, অডিট এন্ড জেনারেল অফিস, এনবিআর, জাতীয় সংসদ এবং এর বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি, বিচার বিভাগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকার অভাবে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় (Way of combat corruption)

দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন বহুমুখী উদ্যোগ। এখানে দুর্নীতি প্রতিরোধের কিছু উপায় তুলে ধরা হলো:

১। রাজনৈতিক সদিচ্ছা: বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা (Political will)। গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মূল ক্ষমতা রাজনীতিবিদদের হাতে। শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি অবলম্বন করেন তবে তার সরকারের অন্য কেউ দুর্নীতি করার সাহস দেখাবে না।

২। দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকা: দুর্নীতি দমন কমিশন, অডিট এন্ড জেনারেল অফিস, এনবিআর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখলে দুর্নীতি প্রতিরোধ অনেকাংশে সম্ভব।

৩। আইনের শাসন এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি নিশ্চিত করা: 'আইন সবার জন্য সমান' এ শ্বাশ্বত বাক্যকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। সবরকমের স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। 'দুর্নীতি

করলে ক্ষমা নেই' এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে অনেকেই দুর্নীতি করতে সাহস পাবে না।

৪। সুশাসন এবং স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতার চর্চা করা: দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসনের বিকল্প নেই। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা। 'গোপনীয়তার সংস্কৃতি' থেকে বেরিয়ে এসে স্বচ্ছতার চর্চা করা জরুরি।

৫। গণমাধ্যমের বলিষ্ঠ ভূমিকা: দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। আবার দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে অনেকে দুর্নীতি থেকে বিরত থাকেন।

৬। দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন: দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের সব স্তরের, সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সোচ্চার ও সক্রিয় হতে হবে। নাগরিক সমাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত গঠন, দুর্নীতির কুপ্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে পলিসি এ্যাডভোকেসি করতে পারে। 'যেখানে দুর্নীতি সেখানে প্রতিরোধ' নীতিতে তরুণ সমাজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হতে পারে। দুর্নীতিবিরোধী গবেষণা ও সামাজিকভাবে দুর্নীতিবাজদেরকে বয়কট করার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকে আরো বেগবান করা যেতে পারে।

৭। মৌলিক চাহিদা পূরণ ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি: ছোট পরিসরের দুর্নীতির একটি বড় অংশের প্রধান কারণ হচ্ছে অভাব, মৌলিক চাহিদা পূরণে সীমাবদ্ধতা। বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মধ্যমে এ ধরনের দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৮। সম্পদের সুষম বণ্টন ও ন্যায়বিচার: ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা গেলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করা হলে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দুর্নীতির কারণসমূহ এবং প্রতিরোধের উপায়গুলো লিখুন।	**সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

দুর্নীতি হচ্ছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা। অতীত-বর্তমান, উন্নত-অনুন্নত প্রতিটি দেশ ও সমাজে কমবেশি দুর্নীতি ছিল এবং আছে। সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আবার এগুলোর চর্চা এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দুর্নীতি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলনও বিশেষভাবে কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দুর্নীতির মূলে রয়েছে–
(ক) উচ্চশিক্ষা (খ) রাজনীতি
(গ) দারিদ্র্য (ঘ) ক্ষমতার অপব্যবহার

২। দুর্নীতি প্রধানত কয় ধরনের?
(ক) দুই ধরনের (খ) তিন ধরনের
(গ) চার ধরনের (ঘ) পাঁচ ধরনের

৩। নিচের কোনটি দুর্নীতি প্রতিরোধে অধিকতর কার্যকর?
(ক) বেতন-ভাতা বৃদ্ধি (খ) সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা
(গ) শিক্ষার হার বৃদ্ধি (ঘ) আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. বাংলাদেশে বর্তমানে (২০১৭) কত শতাংশ মানুষ নিরক্ষর?
ক) ২০ শতাংশ খ) ২৫ শতাংশ গ) ৩০ শতাংশ ঘ) ৩৫ শতাংশ

২. বর্তমানে (২০১৬) বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
ক) ০.৭৯ শতাংশ খ) ১.৩৭ শতাংশ গ) ১.৭৯ শতাংশ ঘ) ২.১১ শতাংশ

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

৩। সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য-
i. অবাঞ্চিত ও ক্ষতিকর
ii. গৌণ বিচ্যুতি
iii. জনগণের সচেতনতা
সঠিক উত্তর কোনটি?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

গ. সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিনঃ

রুমা তাদের গ্রামের স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেছে। হঠাৎ তার বাবা মারা যান। গ্রামে কোনো কলেজও ছিল না। তাই তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। দু'বছর সে বাড়িতেই বসে থাকে। দরিদ্র মা তার বিয়ের চেষ্টা করলেও রুমা তাতে রাজি হয়নি। সে মাকে সহযোগিতার জন্য কাজ খুঁজছিল। কিন্তু তার যোগ্যতা ও প্রত্যাশিত মজুরির কোনো কাজ পাচ্ছিল না। সে দিন দিন হতাশ হয়ে পড়ছিল।

(ক) রুমা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তাকে কী বলে? ১
(খ) বেকারত্ব কয় প্রকার ও কি কি? ২
(গ) বেকার সমস্যার কারণগুলো কি কি? ৩
(ঘ) বেকার সমস্যা প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আপনার সুপারিশ তুলে ধরুন। ৪

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২	ঃ	১। ঘ	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩	ঃ	১। ক	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪	ঃ	১। ক	২। গ	৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫	ঃ	১। ক	২। খ	৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬	ঃ	১। ঘ	২। গ	৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৮	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। গ	২। খ	৩। খ